২১ শিক্ষা (Education)

শিক্ষা (Education) :

'শিক্ষা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল পালন করা বা বড় করে তোলা। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে শিক্ষা বলতে শিক্ষার্থীকে বিশেষ কিছু বিষয়ে নিছক শিক্ষাদান বা পাঠদানকেই বোঝায় না, বরং সাফল্যের সাথে ভবিষ্যতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজনীয় অভ্যাস ও উপযুক্ত মানসিকতা গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই শিক্ষার প্রকৃত অর্থ নিরূপিত হয়।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে শিক্ষা মানবসমাজের এক মৌলিক কার্যপ্রক্রিয়া বিশেষ। প্রকৃতপক্ষে আদিম নিরক্ষর সমাজে যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল না, সেখানে মানুষ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বিভিন্ন ঘটনা বা পরিবেশের সম্মুখীন হলে অপরিণত বয়স্কগণ জীবন আচরণের বিবিধ প্রক্রিয়া বিষয়ে অবহিত হত অভিজ্ঞ-পরিণত গোষ্ঠী সদস্যদের নিকট হতে। কোনো জ্ঞানের বিষয় বা কর্মনৈপুণ্য শিখে নেওয়া হত আনুষ্ঠানিকভাবে, অভিজ্ঞ বয়স্কদের অনুসরণ করে। পরবর্তী সময়ে অপেক্ষাকৃত জটিল সমাজে অর্থাৎ শিল্প-পূর্ববর্তী মধ্যযুগীয় ইউরোপে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিশেষীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে এবং এই জাতীয় আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কেবলমাত্র জনসাধারণের একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমশ শিল্পায়নের প্রসারের ফলে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সকল জনসাধারণের জন্য আধুনিক কালের এই বিধিবদ্ধ ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। তবে এইরূপ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থেরই প্রকাশ।

বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা সমাজের জীবনধারার সাথে সম্পর্কিত, পরিবেশের সামগ্রিক প্রভাব যার দ্বারা শিক্ষা সম্পাদিত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষা কেবলমাত্র একটি পদ্ধতি নয়, এই ধরনের সর্বাত্মক শিক্ষা যেন স্বয়ং শিক্ষা। সমাজবিদ্যার আলোচনায় এই সামগ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। সে অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যক্তি-মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণের সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি, ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপূর্ণ পদ্ধতিই হল প্রকৃত শিক্ষা।

এমিল দুর্খাইম (Emile Durkheim) শিক্ষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—সমাজ জীবনযাপনের প্রস্তুতি হিসাবে পূর্ববর্তী প্রজন্মের গঠিত ক্রিয়াই হল শিক্ষা। সমাজজীবনের চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষা শিশুর মধ্যে দৈহিক, নৈতিক ও বৌদ্ধিক শক্তির জাগরণ ও বিকাশ ঘটায়। সমাজবিজ্ঞানী সামনার (W.G. Sumner) এর মতে, শিক্ষা মূলত একটি বিরামহীন প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে একটি শিশুকে দেখা, অনুভব এবং ক্রিয়াসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত করার চেষ্টা করা হয় যেগুলি ঐ শিশু স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জন করতে পারে না।

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা এমন এক বিরামহীন প্রক্রিয়া যা শিশুর জন্মের সাথে সাথে শুরু হয় ও আমৃত্যু অব্যাহত থাকে। জীবনে চলার পথে ঘটতে থাকা বিবিধ বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই ধরনের শিক্ষাগ্রহণ প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকে। এইরূপ সাধারণ প্রক্রিয়ার সাথে কোনো প্রথাগত আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির সম্পর্ক থাকে না।

সুতরাং বলা যায় যে বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা হল পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত, আনুষ্ঠানিক নিয়মবর্জিত বিষয় যা কোনো সুনির্দিষ্ট বা প্রচলিত ধারা অনুসারে সংঘটিত হয় না। জীবনে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনা থেকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তি অসচেতনভাবে শিক্ষা লাভ করে। এই ধরনের শিক্ষা ব্যক্তিকে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করে ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে সুগম করে।

শিক্ষা বলতে সাধারণ মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকেই বোঝে। সেখানে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পঠন-পাঠন পরিচালিত হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা যৌথভাবে পাঠদান ও পাঠগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের সুযোগ পায়। এই ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া হয়। এই ধরনের সংকীর্ণ শিক্ষা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, সচেতন প্রক্রিয়া।

এই ধরনের প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির সুপ্ত বৃত্তি বা ক্ষমতাসমূহকে প্রকাশিত ও পরিমার্জিত করা। উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরনের প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব অধিকমাত্রায় প্রতিফলিত হয়। বর্তমানে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা সমাজজীবনের একটি স্বাভাবিক ও প্রায় অনুল্লেখ্য নিয়মে পর্যবসিত হলেও এটি ইতিহাসের দিক থেকে প্রায় সাম্প্রতিক ঘটনা।

সংক্ষেপে বলা যায় যে সংকীর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক নির্দিষ্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে আবদ্ধ। যেখানে সুনির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম, পঠন-পাঠন, পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে। এই ধরনের শিক্ষাদান স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। যার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে। শিক্ষার্থী সচেতনভাবে কোনো বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান বা কলাকৌশল আয়ত্ত করে।

মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী শিক্ষা একটি সচেতন সামাজিক কর্মবিশেষ। বিকাশের এই পদ্ধতি উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তিশীল। এই পদ্ধতি স্বাভাবিক, চিন্তামূলক ও পরিবেশ-পরিমণ্ডলের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষা হল একটি সমষ্টিগত ও নির্দিষ্ট মান অনুসারী প্রক্রিয়া। ব্যক্তি-মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশই হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। এটি এক ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি।

মতাদর্শ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নির্বিশেষে সকল দেশই আজ শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছে। শিক্ষা-সংক্রান্ত বিবিধ কর্মসূচি রূপায়ণের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। শিক্ষা-ব্যবস্থা সমতাবাদী বা সেরা শ্রেণি-সংরক্ষণমূলক, যাই হোক না কেন, সকল আধুনিক সমাজই শিক্ষার প্রচার ও প্রসারণকে জাতীয় কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছে।

শিক্ষার সামাজিক ভূমিকা ও কার্যাবলি (Social role and function of education) ঃ

সমাজজীবনে শিক্ষার ভূমিকা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি প্রসঙ্গে সমাজতত্ত্বে বিশদ আলোচনা করা হয়। তবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও সামাজিক ভূমিকা বিষয়ে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হল ব্যক্তি-মানুষের মানসিক উন্নতিসাধন। প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মতো গ্রিক পণ্ডিতগণ জ্ঞান অর্জন করাকেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বলে মনে করতেন। ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুর্খাইম (Durkheim) নতুন প্রজন্মের সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিক্ষার ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্পেনসারের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল পরিপূর্ণ জীবনের সামগ্রিক স্বার্থে প্রয়োজনীয় সবকিছু সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষার্থীকে যথাসম্ভব প্রস্তুত করে তোলা।

উল্লিখিত বক্তব্যসমূহ হতে আমরা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ভূমিকা বিষয়ে সামগ্রিক ধারণা না পেলেও আংশিক রূপটি বুঝতে পারি। সমাজ প্রবাহের বিভিন্ন দিক থেকে শিক্ষার ভূমিকা ও কার্যাবলি বিস্তারিত আলোচনা করা আবশ্যক।

সুপ্তবৃত্তির বিকাশ—শৈশবে মানুষের শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি লুপ্ত অবস্থায় থাকে। শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষের সেই সুপ্ত বুদ্ধিশক্তির বিকাশ-সাধন হয়। সেই সাথে আত্মনিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও জন্মায়। তাই শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য হল ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক বৃত্তিসমূহের সুষ্ঠু বিকাশ।

বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশের সাথে সাথে প্রকৃত শিক্ষা ব্যক্তি-মানুষের আত্মবিশ্বাস ও বিচার-বিবেচনা বোধের ক্ষমতার

জাগরণ ঘটায়। ব্যক্তির এই নিজস্ব চেতনা, যুক্তিবোধের বিকাশ তার ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় করে যা সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের সহায়ক হয়।

সমাজ সচেতনতা—সমাজের আদর্শ ও মূল্যমান সংরক্ষিত রেখে সেগুলি পরবর্তী প্রজন্মদের মধ্যে সঞ্চারিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব শিক্ষার দ্বারাই সম্পন্ন হয়। দুর্খাইম মনে করেন, সমাজের সদস্যদের মধ্যে পর্যাপ্ত একাত্মবোধ বা সমষ্টিগত মনোভাব গড়ে না উঠলে কোনো সমাজই তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। শিক্ষা গোড়া থেকেই শিশুদের মনে সমষ্টিগত জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় সাদৃশ্যগুলি বদ্ধমূল করে দিয়ে সেই একাত্মমূলক চেতনার গতিস্রোত অব্যাহত রাখে। তাই বলা যায় যে, কোনো সমাজের প্রধান কাজ বিশাল জনসাধারণকে এক ঐক্যবদ্ধ সমগ্রে পরিণত করা, সামাজিক সংহতি তৈরি করা। এক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজের একটা সংযোগ সেতু হিসাবে কাজ করে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য—শিক্ষার মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এক প্রজন্ম হতে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। শিশু পাঠ গ্রহণের মাধ্যমে নিজ দেশ, জাতির ইতিহাস, কৃষ্টি, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির সাথে পরিচিতি লাভ করে। ইংরেজ দার্শনিক রস মনে করেন শিক্ষার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা গুরুত্বপূর্ণ। গুণগত শিক্ষা ছাড়াও সমাজের সাথে পরিচয় ঘটানোর প্রেক্ষিতে শিক্ষা সমান তাৎপর্যবাহী।

সুযোগের সমানাধিকার স্থাপন—বিশেষীকৃত কর্মের উপর গুরুত্ব প্রদানের অর্থ হল যথাক্রমে সাফল্য অর্জন ও সুযোগের সমান অধিকারের মূল্যকে স্বীকার করে নেওয়া। সমাজ উচ্চমানের শিক্ষাগত সাফল্য অর্জনকে উৎসাহিত করে ও সফল ছাত্রকে পুরস্কার প্রদান সফলতাকেই আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করে। আবার পরীক্ষার মাধ্যমে সকলকে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিয়ে সুযোগের সমানাধিকার আদর্শকে বজায় রেখেছে। সমগ্র সমাজের দিক থেকে সাফল্যের স্বীকৃতি ও সমানাধিকারের বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ফলে, বিজয়ী বা বিজিত কারোর মধ্যেই শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকে না।

স্তরবিন্যাস—শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়েই সমাজের যোগ্যতম প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ সমাজ ও সমাজবাসীদের স্বার্থে কার্যকর ও ফলপ্রসূ বিভিন্ন অর্থবহ ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়। এঁরা শিক্ষার দিক থেকে যোগ্যতা ও সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পদ ও পদমর্যাদা লাভ করেন। তাই বলা যেতে পারে সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। অধ্যাপক ডেভিস তাঁর '*Human Society*' গ্রন্থে বলেছেন—শিক্ষাব্যবস্থা যোগ্যতা প্রমাণ করার কষ্টিপাথর এবং সেই কারণেই তা সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন পদমর্যাদায় আসীন করে দেওয়ার এক নির্বাচনমূলক মাধ্যম বিশেষ। স্তরবিন্যাস সমাজ ব্যবস্থায় এক স্বাভাবিক গঠন এবং সেই বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রবণতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী ব্যক্তিকে নিয়োগ করে সামাজিক কর্মশক্তির বিকাশ ঘটানো হয়।

শিক্ষার বৃত্তিগত ভূমিকা—জীবনধারণে সমান নাগরিক তৈরি করার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বৈষয়িক বা বৃত্তিগত বিষয় সম্বন্ধে ধারণা লাভ করে ও ভবিষ্যতের জীবিকা নির্বাহের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। ব্যক্তি নিজের ও পরিবারের সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তিকে উৎপাদনমূলক ক্রিয়াকর্মে উপযোগী করে তোলার ব্যাপারে শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। মানুষের বিশেষীকৃত কর্মকুশলতার উপরেই নির্ভরশীল থাকে শিল্প সভ্যতার অস্তিত্ব ও বিকাশের ধারাবাহিকতা।

শিক্ষার রাজনৈতিক অবদান—শিক্ষার মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তি সচেতনতার সঙ্গে নিজেকে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলে। একজন মানুষ যত বেশি উৎকৃষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করবে, তার দলীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা ততই বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও শিক্ষার পারস্পরিক সদর্থক সম্পর্ক রয়েছে। উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা মানুষ নিজ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ, গোষ্ঠীস্বার্থ ছাড়াও বৃহত্তর রাজনৈতিক সমস্যাকেও সমাধান-উপযোগী ক্রিয়াকলাপের পথে পরিচালিত করতে পারে। আধুনিক রাজনীতিতে বিক্ষোভ বা প্রতিবাদ জ্ঞাপনকে আদর্শ হিসাবে ধরা হয়। এক্ষেত্রে একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রতিবাদকে যথার্থ অর্থে গণতান্ত্রিক রাজনীতির অপরিহার্য মাধ্যমে পরিণত করে দিতে পারে। সুতরাং রাজনৈতিক আচার-আচরণের মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

শিক্ষা ও সামাজিকীকরণ—সমাজে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ-ব্যবস্থা ও সামাজিক জীবনধারার বৈশিষ্ট্যাবলি বজায় রাখতে সাহায্য করে। সমাজের আদর্শ, কৃষ্টি ও জীবন ধারাবাহিকতা এর মাধ্যমে অব্যাহত থাকে। শিক্ষার দ্বারা এক যুগ বা এক পুরুষের আদর্শ ঐতিহ্য উত্তর পুরুষের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সাথে আদান-প্রদানমূলক আচরণে অভ্যস্ত হয়। এই অভিজ্ঞতা গ্রহণের মাধ্যমে সে বুঝতে পারে কীভাবে বৃহত্তর সমাজের সদস্যদের সঙ্গে পারস্পরিক আচরণ করতে হবে। সমাজতত্ত্বের ভাষায় এটাই সামাজিকীকরণ। সামাজিকীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থা উপযুক্ত পদ্ধতি বিশেষ, একটি শিশুর শৈশবাবস্থা হতেই তার সামাজিকীকরণ শুরু হয়। একেবারে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের কোনো সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা না থাকলেও পরবর্তীকালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারা নির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিতভাবে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী সমাজের রীতিনীতি, আদর্শ, ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, কৃষ্টির সাথে পরিচিত হয় এবং সেইরূপ আচার-আচরণ, আদর্শ অনুসারে নিজেকে একজন সমাজের অন্যতম সদস্য হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

অতএব বলা যায় ব্যক্তির সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যবাহী। তবে প্রচলিত এই শিক্ষাব্যবস্থা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে শিক্ষার্থীর সামাজিকীকরণ যথাযথভাবে হয় না, উপরন্তু শিক্ষার্থীর মধ্যে অসামাজিক আচরণের প্রবণতা জন্মায়। তাই সকল সমাজেই সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও যথাযথ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। তবেই সামাজিকীকরণ উপযুক্তভাবে সংগঠিত হয়, সমাজজীবন সুসংহত, শান্তিপূর্ণ, প্রগতিশীল হয়। সমাজস্থ ব্যক্তি সমাজের প্রচলিত আদর্শ, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ইত্যাদি মেনে চলার ক্ষেত্রে সচেষ্ট হয়।

প্রাক শিল্পযুগে সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিশেষ কোনো গুরুত্ব না থাকলেও শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা কিছু মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবুও বলা যায়, সামাজিকীকরণের স্বার্থে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অপরিহার্য বলে গণ্য হত না। ব্যক্তির পরিবার, আঞ্চলিক মানুষজনের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সামাজিকীকরণ সম্পন্ন হত। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পরবর্তীকালে অর্থাৎ আধুনিক যুগে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষীকরণের ফলে উপযুক্ত দক্ষতা ও জ্ঞানার্জনের তাগিদে শিক্ষা ব্যবস্থার সামাজিক মূল্য ক্রমবর্ধমান।

আধুনিককালে সমাজের গঠন, গতিপ্রকৃতি ক্রমশই জটিল হতে জটিলতর হয়ে পড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির ফলে বহু সমাজে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম, বর্ণের মানুষের সহাবস্থান ঘটেছে। এরকম ক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন বিবিধ আনুষ্ঠানিক আচার-পদ্ধতি। উপযুক্ত আধুনিক শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে এক সংযোগকারী শক্তির সৃষ্টি হয় যার দ্বারা সে সামাজিক সম্পর্ক বজায় রাখে, ফলে সামাজিক সংহতিও সুদৃঢ় হয়। সুতরাং অধুনা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সকল সমাজেই শিক্ষাব্যবস্থায় শ্রেণিবিন্যাসের প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। বটোমোরের মতে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার মানসিকতা গড়ে তোলার অর্থ হল শ্রেণিগত আদর্শ অথবা মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার প্রচলন করা। তাই সকল সমাজেই শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখা যায়। ধনী শ্রেণির সন্তানগণ সমাজের বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায়। ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থায় সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের প্রভাব দেখা যায়। ইংল্যান্ডে প্রতিটি সামাজিক শ্রেণি নিজেদের জীবনধারা স্বতন্ত্র রাখতেও অন্যান্য সামাজিক শ্রেণির সাথে সম্পর্ক এড়িয়ে চলে। ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থাও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও বিভিন্ন শ্রেণির জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাপক বটোমোর-এর মতে, সকল সমাজেই শ্রেণি-বৈষম্যের অনুরূপ বৈষম্য শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। যেখানেই সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য রয়েছে, সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থাতেও অনুরূপ শ্রেণিবিভাগ দেখা যায়।

শিক্ষাকে মাধ্যম করে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের উচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়া যেতে পারে। সামাজিক মর্যাদা এবং আয়ের নিরিখে আকর্ষণীয় কোনো পদ লাভের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সমস্ত পদে আসীন ব্যক্তিবর্গ তাদের গুণগত যোগ্যতার ভিত্তিতে উন্নত মর্যাদা লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের সন্তান-সন্ততিরাই উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। তাই অনেকের মতে, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস বজায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তাই বলা যায়, শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামাজিক স্তরবিন্যাসের এক গভীর সংযোগ বর্তমান।

শিক্ষা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Education and Social control) :

সাধারণত সমাজব্যবস্থায় প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির সমষ্টিকে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলে। অধ্যাপক বটোমোরের মতে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হল বিশেষ কিছু সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, আইন এবং আদর্শের সমষ্টি যার মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের শ্রেণিগত ও দলগত বিরোধের মীমাংসা হয় এবং সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। সমাজের অস্তিত্ব এবং অগ্রগতিকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করার জন্য সমাজবদ্ধ মানুষের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়।

শিক্ষা এই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের এক নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আচার-আচরণ একটি নির্দিষ্ট রূপ পায় ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে বেশিরভাগ দেশেই সমাজে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর কমবেশি সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয় যা অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে বিবেচিত হয়।

সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার, মূল্যবোধ ইত্যাদির সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। ফলে মানুষ সামাজিক বিধিনিষেধ ও রীতিনীতিগুলি অভ্যাসবশেই মেনে চলতে সচেষ্ট হয়। তার আচার-আচরণ, চিন্তা-ভাবনা, সমাজজীবন ও কৃষ্টিধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এর ফলে ব্যক্তি কর্তৃক কোনোরকম বিরোধ বা দুষ্ক্রিয়তার সম্ভাবনা রোধ হয়, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

সামাজিক ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার যথেষ্ট ভূমিকা বর্তমান। শিক্ষার মাধ্যমে সুস্থ-পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে ফলে সমাজ জীবনে সম্প্রীতি, সৌভ্রাতৃত্ববোধ বজায় থাকে। সমাজ-জীবন, স্বচ্ছন্দ ও শান্তিপূর্ণ হয়। আবার শিক্ষা ব্যবস্থার কল্যাণেই সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষিত হয়। ব্যক্তিমানুষ শিক্ষালাভের মাধ্যমে যুক্তিবাদী ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগকে নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য লাভ করে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ রাখে, তাই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষা পরোক্ষ ভূমিকা নেয়। শিক্ষার প্রভাবে দায়িত্বশীল, সমাজ সচেতন মানুষ সংকীর্ণ স্বার্থ-চিন্তা অতিক্রম করে সমষ্টিগত কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করতে পারে। শিক্ষানবিশদের মধ্যে সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ জাগ্রত করে। ফলে, তাদের পক্ষে নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়। সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে শিক্ষা যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানুষের মনে সততা, ন্যায়বোধ ও আইন মেনে চলার এক স্বাভাবিক প্রবণতার সৃষ্টি করে। যথার্থ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রক হিসাবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়। এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তা বিশেষভাবে কার্যকরীরূপে প্রতিপন্ন হয়।

আজকের দিনে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ব্যাপক বিস্তার লাভের ফলে সমাজের সর্বত্র আধুনিকীকরণের আবির্ভাব ঘটেছে। এই আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজে সামাজিক নিয়ামক হিসাবে শিক্ষার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। সামাজিক জীবনধারাগত বৈশিষ্ট্যের সাথে শিক্ষাব্যবস্থার অসঙ্গতি লক্ষণীয়। শিল্প সভ্যতার বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক উত্তরাধিকারের পরিবর্তে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পায়। এই ধরনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজ-স্বীকৃত মূল্যবোধ, সামাজিক আদর্শ, ন্যায়-নীতির ধারণা গুরুত্বহীনরূপে প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ও চেতনাকে স্বতন্ত্র রূপ দান করলেও সমাজবদ্ধ মানুষ সামাজিক জীবনধারা ও অভিজ্ঞতার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে না। এর ফলে মানুষের মন ও সমাজ প্রকৃতির মধ্যে সংঘাত দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় শিক্ষা সামাজিক নিয়ামক হিসাবে তার গুরুত্ব অনেকাংশে হারিয়ে ফেলে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষার নিয়ামক ক্ষমতা হ্রাসের ব্যাপারে গণমাধ্যমের প্রতিকূল প্রভাব ঘটে। বাণিজ্যিক সমাজ সভ্যতায় সাধারণ মানুষের মৌলিক চিন্তা-ভাবনার উপর সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যমের কার্যকরী প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়, যা মানুষ চিন্তাচেতনায় স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রচার মাধ্যমগুলির সাথে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার নীতি ও আদর্শগত পার্থক্য চোখে পড়ে। যা শিক্ষার্থীদের মনেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এর ফলেই শিক্ষা তার গুরুত্ব হারায়। এইভাবে গণমাধ্যমগুলি বর্তমানে সামাজিক নিয়ামক হিসাবে

শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকার উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আধুনিক ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টান্ত অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক।

বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা কি যথেষ্ট (Is purely scientific education sufficient) ?

আধুনিক সমাজ সভ্যতা অতিমাত্রায় বিজ্ঞান-নির্ভর। প্রতিটা ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানমনস্কতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সেই দিককেই তুলে ধরে। অনুরূপ প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রেই যথেষ্টরূপে পরিস্ফুট। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদর্শন ক্রমশ সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি মানবিক বিদ্যাগুলির অবদান ও তাদের যৌক্তিকতার উপরে এক প্রশ্নচিহ্ন জুড়ে দিয়েছে। ডারউইনের 'Origin of Species' এর মতবাদ শিক্ষাক্ষেত্রে পরম্পরাগত চিন্তাধারার প্রতি যেন চ্যালেঞ্জস্বরূপ। টমাস হেনরী হাক্সলেও সরাসরি বিজ্ঞানকেই শিক্ষাসংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেন। আজকের দিনের এই উন্নত সমাজ-জীবন গড়ে ওঠার পশ্চাতে বিজ্ঞানের ভূমিকা সত্যই অনস্বীকার্য। কেননা, বিজ্ঞান কেবলমাত্র শিল্প ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, সেই সাথে এ যুগের দর্শন ও নৈতিক ধ্যান-ধারণাও গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ভিত্তি করে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি অপরিহার্য সমাজকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান প্রভূত উপকার সাধন করে চলেছে। সুতরাং বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রভূত উপকার সাধন অস্বীকার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি আমাদের অনুভূতি, চিন্তাধারাও অনেকটাই বৈজ্ঞানিক চেতনা দ্বারা প্রভাবিত। প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতিসাধন, গবেষণামূলক ক্রিয়াকলাপ, কঠোর পরিশ্রম ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ; এর ফলে সমাজের জাতীয় জীবনে যে উন্নতিসাধন ঘটে চলেছে তা বলাই বাহুল্য। সমাজস্তরে যোগ্যতম ব্যক্তিবর্গই অর্জিত সামাজিক মর্যাদা লাভ করছেন এবং এই শিল্প-নির্ভর সমাজের জন্যই অধিকহারে অভীষ্ট-লক্ষ্য-প্রণোদিত এবং সাফল্য-অর্জন-সচেষ্ট একটি কর্মীগোষ্ঠীরও প্রয়োজন আছে। এমন অবস্থায় সমাজস্থ প্রতিটি ব্যক্তিবর্গই নিজস্ব যোগ্যতা প্রতিপন্ন করার সমান সুযোগ পাচ্ছে।

সমাজ জুড়ে এই বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপের যে কর্মযজ্ঞ চলেছে, যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির বাতাবরণ রচিত হয়েছে, সেটি প্রায়শই আক্রমণাত্মক ও দুর্নীতি মনোভাবাপন্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে, যার অশুভ প্রভাব বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রকে কলুষিত করছে। নির্বাচিত শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি যে সর্বদাই সমাজের প্রতিটি মানুষকে সুখী ও শান্তিপূর্ণ করে তুলতে পারে—এমন ধারণাও ভ্রান্ত বলে পরিগণিত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা যতই প্রসারিত হচ্ছে ততই পার্থিব সমৃদ্ধি ও মানবীয়-নীতি গুণাবলির দ্রুত অবনমন—এই বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। সুস্থ সমাজ রক্ষার্থে যা কখনোই কাম্য নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রেও বৈষম্য চোখে পড়ার মতো। সরকারি ও বেসরকারি যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বিজ্ঞান বিষয়ের পঠন-পাঠনে অত্যধিক জোর দেওয়া হচ্ছে, অপরদিকে কলা বিভাগীয় বিষয়গুলি আজ উপেক্ষিত। প্রতিটি সরকারি স্তরেই বিজ্ঞান পঠন-পাঠনে বিপুল পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হলেও মানবিক বিদ্যাগুলির চর্চায় ব্যয়সংকোচন চরম পক্ষপাতীত্বের নিদর্শন। একথা সত্য যে সাহিত্য, ইতিহাস বা দর্শন বিষয়ের থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষীকৃত গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নির্দেশের আধিপত্য গবেষণার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে ব্যর্থ ও বিনষ্ট করে দিতে পারে। কারণ একমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীন গবেষণাই ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে। তবে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কেবল বিজ্ঞান-কলা বিষয়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে নয়। প্রকৃতপক্ষে বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিসেবা, বিবিধ প্রযুক্তির উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে রাষ্ট্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি এতো বেশি পক্ষপাতিত্ব করে ফেলে যার ফলস্বরূপ সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা লক্ষ্য করা যায়।

অতীতকালে যখন সামাজিক কলাবিদ্যাগুলি যথেষ্ট চর্চিত হত সেই সময়ে বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ এক আত্মতুষ্টিতে ভুগতেন ও এক প্রকার উন্নাসিকতা বা শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতেন, তা একেবারেই অনভিপ্রেত ছিল এবং এই ধরনের সংকীর্ণ মানসিকতা উদারনৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থবিরতা সৃষ্টি করেছিল। তবে শিক্ষাক্ষেত্রে জ্ঞানার্জনের বিষয়ে এই ধরনের মানবিকবিদ্যার অবদান কম নয়। বিষয়বস্তুর অবস্থান, আকৃতি নির্ধারণে, মানুষের মনে নীতি-আদর্শ বোধের উন্মেষে, মানব চরিত্র বিষয়ে গভীর তত্ত্বের উদ্‌ঘাটন, মানুষের হৃদয়াবৃত্তির স্বরূপ বিশ্লেষণে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি কলাবিভাগীয় বিষয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। যার মূল্য আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

কেবলমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষাই শিক্ষার্থীকে পূর্ণ শিক্ষা দিতে সক্ষম হতে পারে না। এটা যতই অপরিহার্য হোক না কেন, বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে শিক্ষার্থীকে ঐতিহ্যবাহী, সংস্কৃতিমনস্ক, চরিত্র গঠনকারী, মানবিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সমান জরুরি। বস্তুমুখী জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের যেমন আবশ্যিকতা রয়েছে, ঠিক তেমনই উদার মানসিকতা বোধের জাগরণে, কল্পনাশক্তির বিকাশ লাভে, পরম্পরাগত ঐতিহ্য সংরক্ষণে, কলাবিষয়ক বিদ্যার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। প্রযুক্তির উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে উদারনৈতিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করে চললে জীবন-আচরণ পদ্ধতির অবসান ঘটবে এবং সমাজও প্রাণশক্তির দিক থেকে পঙ্গু হয়ে পড়বে। সমাজে একজন উন্নতমানের প্রযুক্তিবিদ যেমন প্রয়োজন, একজন বিবেচনাবোধসম্পন্ন, সংস্কৃতিমনস্ক, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তির প্রয়োজন আরো বেশি। সকল সামাজিক প্রয়োজনীয়তা বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা মিটতে পারে না, বৈজ্ঞানিক ও মানবিক বিষয়ের সমন্বয় সাধিত হলে উপযুক্ত, ভারসাম্যযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গঠিত হবে যা সমগ্র সমাজের প্রয়োজন সাধনে সমর্থ হবে।

ভারতের সামাজিক পরিবর্তনে শিক্ষার ভূমিকা (Role of education in the social change of India) ঃ

ভারতীয় সমাজ বিচিত্রমুখী। নানাবিধ ভাষা, জাতি, ধর্মের সংমিশ্রণে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার এক মিশ্রিত রূপ গড়ে ওঠে। প্রাচীনকাল থেকে এই বৈশিষ্ট্যবাহী সমাজব্যবস্থা সময়ের সাথে সাথে প্রবহমান। ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম ও বিজ্ঞান চর্চা পাশাপাশি অবস্থান করে ভারতীয় সমাজের ক্রম পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ভারতীয় সমাজের পরিবর্তন ধারায় শিক্ষার ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। ব্রিটিশ শাসনকালে শিক্ষা কিছু শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দেশীয় শিক্ষাবিদ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনে সক্ষম হন ও আপামর ভারতবাসীকে শিক্ষার আলোতে সিঞ্চিত করার শুভ উদ্যোগ নেন। প্রাক্ স্বাধীনতার যুগে দেশের অধিকাংশ মানুষই ছিল নিরক্ষর, তাই সমাজও ছিল সংস্কারগ্রস্ত, রক্ষণশীল, অচল। যা ছিল প্রগতির পরিপন্থী। স্বাধীনোত্তর কালে স্থবির সমাজ ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত, সচল করতে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ শিক্ষার সামাজিক ভূমিকা অনুধাবন করেন। ১৯৬৮ সালে ভারত সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি রচিত হয় এবং সপ্তম যোজনার মধ্যে সেই জাতীয় শিক্ষানীতিকে আরো সম্প্রসারিত ও গুণগতভাবে উন্নত করার উপর জোর দেওয়া হয়।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সাম্যবাদ ও যৌক্তিক বিচার বোধের প্রসার। বিজ্ঞানমুখী পাশ্চাত্য শিক্ষা 'সাম্য' ধারণার তাৎপর্য শিখিয়ে ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিকে পরিচালিত করে। পরবর্তী পর্যায়ে এগুলি বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, লোকমান্য তিলক বা মহাত্মা গান্ধি প্রমুখ সমাজ সংস্কারকদের অবদান অনস্বীকার্য; যাঁরা জাতি বর্ণভেদের ঊর্ধ্বে মানবতাবাদের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। সমতাবাদী, যুক্তিভিত্তিক চিন্তাভাবনাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে বিবিধ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সামাজিক সাম্যকে আরো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলেছে। উদারনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষাদানের মাধ্যমে অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধকরণ, পশ্চাদ্‌গামী মানুষদের উন্নতিসাধন, শিক্ষা সংস্কৃতি জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে সমানাধিকার প্রভৃতিকে সামাজিক স্বীকৃতি দিয়ে সামাজিক সমতাবাদী করার প্রয়াস চলেছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার পর শ্রেণি, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরে শিক্ষার প্রসার ঘটে। আধুনিককালে কেবল প্রাথমিক শিক্ষাই নয়, শহরাঞ্চলের মানুষের ন্যায় গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যেও উচ্চশিক্ষার প্রতি সমান আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে গ্রাম শহর ব্যতিরেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসাবে আর্থিক স্বচ্ছলতা, পেশাগত মর্যাদা, রাজনৈতিক প্রভাব ইত্যাদিই বিবেচিত হয়। ষাটের দশকের শেষদিকে এম. এস. গোরে (M. S. Gore) 'জীবিকাসংক্রান্ত' প্রেক্ষাপট নির্ণয় করতে গিয়ে দেখেন, স্কুলের ক্ষেত্রে ২১ থেকে ৩৫ শতাংশ ও কলেজের ক্ষেত্রে আরো উচ্চহার সম্পন্ন ছাত্রের অভিভাবকগণ বিভিন্ন গ্রামীণ জীবিকা হতে অর্থ উপার্জন করেন। ফলে বলা যায় সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার দরকার।

শিক্ষার সামগ্রিক প্রসারের ফলে আমাদের পরম্পরাগত সামাজিক স্তর-বিন্যাসের ক্ষেত্রে জাতিগত বিষয়টির গুরুত্বের পরিবর্তে বৃত্তি বা পেশাগত বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত এমন একটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীকে

মননশীল সেরা শ্রেণি' (Intellectual elite) আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও এই ধরনের বিদেশি শিক্ষাপ্রাপ্ত, স্বতন্ত্র জীবনশৈলী সম্পন্ন মননশীল পণ্ডিতদের দেখতে পাওয়া যায়।

পরম্পরাগত জাতিভেদ প্রথা অনুযায়ী কোনো বৃত্তি বা পেশার পবিত্র-অপবিত্রতা বিচার্য হত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা। শিক্ষার আধুনিকীকরণের ফলে বৃত্তিকে দেখা হয় নিছক উপযোগিতার মানদণ্ডে, অর্থোপার্জনের দিক থেকে। এই মূল্যবোধ শ্রমের মর্যাদাকে গুরুত্ব দেয় বলে ব্রাহ্মণের পক্ষে চর্ম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া অস্বাভাবিক রূপে গৃহীত হয় না। আবার ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক পর্যায়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থসমস্যা নিয়ে প্রচারপর্ব, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাখার সাংবিধানিক অধিকার ইত্যাদি ঘটনাও সমাজের মানুষের মনে ধর্মীয় পৃথকীকরণের চেতনাকে ক্রমশ তীব্র করে তুলছে।

শিক্ষা-ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে রাখার এক অভিসন্ধিমূলক রাজনৈতিক প্রয়াসও অধুনা সমাজব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। জাতি, বর্ণের ভিত্তিতে বা ধর্মীয় নীতি অনুসারে গঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে এইরূপ সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে পছন্দমতো ছাত্র বা শিক্ষক নিয়োগের ঘটনাও ঘটে। এই ধরনের শিক্ষাসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদেও মদত জোগায়। রাজনীতিবিদ কর্তৃক এহেন শিক্ষার বিকৃতকরণের ফলে সমাজ ব্যবস্থার স্বচ্ছ সাংস্কৃতিক পরিবেশ কলুষিত হয়।

শিক্ষা ও সামাজিক সচলতা (Education and Social Mobility) ঃ

সামাজিক সচলতা প্রতিটি সমাজেরই এক স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়া বিশেষ। কিম্বল ইয়ং ও রেমন্ড ডব্লু. ম্যাকের মতে, "সামাজিক সচলতা কথাটি কোনো ব্যক্তির বা কোনো গোষ্ঠীর বা কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষের পদমর্যাদাগত পরিবর্তন বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং সামাজিক সচলতা কথাটির দ্বারা আমরা সমাজ কাঠামোর অভ্যন্তরে যে পরিবর্তন অথবা পরিবর্তনসূচক গতি-প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় সেই প্রক্রিয়াকেই বুঝিয়ে থাকি। সমাজের অভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধার উপরই সামাজিক সচলতা বা সমাজের পদমর্যাদাগত পরিবর্তন নির্ভর করে।

সামাজিক সচলতার গতিমুখ দু ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমটি হল অনুভূমিক সচলতা। এটি সমপর্যায়ভুক্ত এক স্তর হতে অন্য স্তরের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদাগত উত্তরণকে বোঝায়। দ্বিতীয়টি হল উল্লম্ব সচলতা (Vertical mobility)। এক্ষেত্রে ব্যক্তির মর্যাদাগত পরিবর্তনের দিকটি কখনো উর্ধ্বাভিমুখী কখনো নিম্নাভিমুখী। দ্বিতীয়টি প্রথমটি হতে অধিক তাৎপর্যবাহী।

সামাজিক সচলতার বিষয়ে শিক্ষার এক বিরাট ভূমিকা থাকে। সকল সমাজেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়েছে যাতে সমাজের প্রতিটি নাগরিকই শিক্ষার সমান সুযোগ লাভ করে। শিক্ষার প্রসার ঘটলেই সমাজের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব হবে।

কেবলমাত্র শিক্ষিত মানুষই বিভিন্ন শ্রেণি, জাতি সম্বলিত সমাজে পারস্পরিক ভাবে চিন্তাধারা ও মতামতের আদান প্রদান করতে পারে। অশিক্ষা, সংস্কারগ্রস্ত মানসিকতা সমাজের গতিকে রুদ্ধ করে, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন উদার মানসিকতা সমাজের ধারাবাহিকতাকে রক্ষা করে। এমিল দুর্খাইম সামাজিক সচলতার স্বার্থে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার চর্চার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

ট্যালকট পারসন্স এর মতে, সামাজিকীকরণের অন্য রূপই হল সামাজিক সচলতা। কারণ সুযোগের অবাধ অধিকার এবং অবস্থিতি সম পরিমাণেই সামাজিকীকরণের জন্য ও সামাজিক সচলতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে প্রয়োজনীয়। শিক্ষা যেহেতু সামাজিকীকরণের প্রধান মাধ্যম সেহেতু শিক্ষা সামাজিক সচলতার এক সক্রিয় উপাদান হিসাবে গৃহীত। অতীতে উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মানুষের মনে আদর্শ, মূল্যবোধ, সংস্কৃতিবোধ সৃষ্টি করে শ্রেণিবৈষম্য দূরীকরণে সচেষ্ট ছিল। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থা কর্মসংস্থান ও কর্মের বিশেষীকরণের উপর গুরুত্ব দেয়। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে উদারনৈতিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতা না হারালেও দ্বিতীয় প্রকার শিক্ষার প্রসারে জাতি-ধর্ম-শ্রেণি নির্বিশেষে সকলে নিজ যোগ্যতা প্রমাণের ও বিভিন্ন বৃত্তিতে আসীন হওয়ার সুযোগ লাভ করছে। এর ফলেও সামাজিক সচলতা যথেষ্ট ক্রিয়াশীল হচ্ছে।

ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষাক্ষেত্রে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্ষেত্রে ও জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে নারীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ইত্যাদির ফলে সামাজিক সচলতাকেই অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস চালানো হয়। পেশার ক্ষেত্রে জাতিগত প্রভাব-এর পরিবর্তে শ্রমের মর্যাদার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। সে কারণে চর্মকারের সন্তানের ও ব্রাহ্মণের সন্তানের চামড়ার ব্যবসা করার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। এই ধরনের মানসিকতাও সামাজিক সচলতার পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

তবে সামাজিক সচলতার ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকার কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। শিক্ষার সুযোগ থাকলেও শিক্ষিত বা অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত এরূপ স্তরবিন্যাস থেকেই যায়। আবার অনগ্রসর জাতি উপজাতির মানুষদের জন্য শিক্ষা বা চাকুরির ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠিকে হ্রাস করার ব্যবস্থাটি অনেকক্ষেত্রে সামাজিক সংকটের সৃষ্টি করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে সমাজ প্রবাহ কোথাও সীমিত হয়েছে, বা কোথাও রুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিক মনে করেন শিক্ষার প্রসার সামাজিক সচলতা বা সামাজিক স্তরবিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনেনি। যোগেন্দ্র সিং তাঁর '*Modernisation of Indian Tradition*' বইটিতে দেখিয়েছেন, উচ্চতর শিক্ষা কিছু ধনী, মর্যাদাসম্পন্ন উচ্চশ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। চাকুরি বা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠি হ্রাস করে সংরক্ষণ প্রথা শিক্ষা-ব্যবস্থাকে সামাজিক অচলতার মাধ্যমে পরিণত করেছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার প্রকৃত ভূমিকাকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।